বাংলা কাব্য-কবিতায় মাইকেল মধুসুদন দত্ত

মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) আবির্ভাব এমন এক সময়ে হয়, যখন বাংলা কাব্যে ছিল পৌরাণিক ও মঙ্গলকাব্যের পুরোনো ধারা এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সামাজিক ব্যঙ্গ-কৌতুকের ধারা। এই সময়ে বাংলা কাব্যে কাহিনিনির্ভরতা থাকলেও মহাকাব্য রচনার উপযুক্ত রীতি ও ছন্দ ছিল না। মধুসূদন যখন বিদেশি সাহিত্যে হোমার, ভার্জিল, দান্তে এবং মিলটনের মতো মহাকবিদের রচনা পড়ছিলেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, বাংলা ভাষায়ও এমন মহাকাব্য রচনা করা সম্ভব। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও ছন্দে বাংলা কাব্যের যাত্রা শুরু করেন। তিনি বাংলা কবিতার এই পুরোনো অচলায়তন ভেঙে দিয়ে নতুন পথের সন্ধান দেন।

রচিত গ্রন্থসমূহ

- তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)
- মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)
- বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২)
- ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১)
- চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)

গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

এটি তাঁর প্রথম কাব্য। এই কাব্যে তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য-এর মূল বিষয়বস্তু হল একটি পৌরাণিক কাহিনি। প্রাচীনকালে সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই অসুর ভাই তাদের প্রচণ্ড প্রতাপের কারণে দেব-দেবীদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে। তাদের দুর্দশা দেখে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বিশ্বের সমস্ত সুন্দর বস্তু থেকে তিল তিল করে সৌন্দর্য নিয়ে তিলোত্তমা নামে এক নারী সৃষ্টি করেন। তিলোত্তমার রূপের মোহে দুই অসুর ভাই পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং একে অপরকে হত্যা করে। এভাবেই দেবতারা তাদের স্বর্গরাজ্য ফিরে পান।

মেঘনাদবধ কাব্য

এটি মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম কীর্তি। নয়টি সর্গে বিভক্ত এই মহাকাব্যে তিনি রামায়ণ কাহিনির পুনর্গঠন করে প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এখানে রামকে নয়, বরং রাক্ষসকুলপতি রাবণ এবং তার পুত্র মেঘনাদকে বীর ও মহৎ রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। কাব্যের মূল উপজীব্য হল মেঘনাদের বীরত্ব ও মৃত্যু, যা লঙ্কাবাসী এবং রাবণের কাছে এক বিশাল ট্র্যাজেডি হিসেবে বিবেচিত। এই কাব্যে রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র যেমন লক্ষণ, সীতা, বিভীষণ এবং হনুমানকে আধুনিক মানবিক দিক থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। কাব্যটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং পশ্চিমা সাহিত্যের মহাকাব্যিক রীতির সফল প্রয়োগ।

বীরাঙ্গনা কাব্য

এটি এক ধরনের পত্রকাব্য। পৌরাণিক কাহিনির নারী চরিত্ররা, যেমন শকুন্তলা, তারা, কৌশল্যা, জনা প্রমুখ তাঁদের প্রেমিক বা স্বামীদের কাছে পত্র লিখে নিজেদের মনের কথা, প্রেম, বিরহ, ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক পত্রকাব্য।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

এটি রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক এক গীতিকবিতা সংকলন। এতে রাধার বিচ্ছেদ, প্রেম এবং বিরহের আবেগপূর্ণ চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যদিও এর বিষয়বস্তু ঐতিহ্যবাহী, কিন্তু এর প্রকাশভঙ্গি ছিল আধুনিক এবং রোমান্টিক।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

এই কাব্যগ্রন্থে তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট (Sonnet) প্রবর্তন করেন। এতে কবি তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি, স্মৃতি এবং স্বদেশপ্রেমকে গভীর আবেগের সাথে তুলে ধরেছেন।

অবদান

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন

এটি তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান। এর ফলে বাংলা কবিতায় পয়ারের মতো মাত্রাবৃত্ত ও অন্ত্যমিলের সীমাবদ্ধতা দূর হয় এবং কবিতা এক নতুন গতি ও বৈচিত্র্য লাভ করে। এই ছন্দ বাংলা কাব্যকে মহাকাব্য রচনার উপযোগী করে তোলে।

মহাকাব্যের জন্ম

তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে, বাংলা ভাষাতেও মহাকাব্যের মতো বিশাল ও গম্ভীর বিষয় নিয়ে লেখা সম্ভব।

পৌরাণিক চরিত্রের আধুনিকীকরণ

তিনি তাঁর কাব্যে পৌরাণিক চরিত্র, যেমন রাবণ, মেঘনাদ এবং সীতাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন। তিনি তাদের মানবিক দুর্বলতা ও মহানুভবতাকে তুলে ধরেন, যা তাঁদেরকে আরও বেশি জীবন্ত ও বাস্তব করে তোলে।

সনেটের প্রবর্তন

তিনি বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তন করে কবিতার আঙ্গিকে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। এর মাধ্যমে কবিরা স্বল্প পরিসরে গভীর চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ পান।

আধুনিকতার সূচনা

মধুসূদনের কাব্যে মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ, রোমান্টিক আবেগ এবং ব্যক্তির গুরুত্বের যে প্রতিফলন দেখা যায়, তা বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটায়। তাঁর কাজ বাংলা সাহিত্যের গতিপথ চিরতরে বদলে দেয়।